কালের কণ্ঠ

তারিখ ...13 FEB 2014...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭...

সৈয়দ এলতেফাত হোসাইন ▶

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য নীতিমালা প্রয়োজন

বিশ্ববিদ্যালয় মানেই হচ্ছে বিশ্বমানের কোনো বিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, যেখান থেকে বেরিয়ে আসবে জাতি গড়ার কারিগর। যারা স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। যারা সত্যের জন্য জীবন বাজি রাখবে। রুখবে সব ধরনের দুর্নীতি আর অন্যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এরূপ মুক্তমনা আর দেশ গড়ার কারিগর বের হওয়ার আশা যেন নেই বললেই চলে। কারণ যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা, তারাই আজ অন্যায়ের কাছে মাথানত করছে। মুখ বুঁজে সইছে সব ধরনের অন্যায়-অবিচার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এমন অকর্মণ্য করে তোলার পেছনে কাজ করছে মূলত শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতা, শিক্ষকরাজনীতি আর চরিত্রহননকারী ছাত্ররাজনীতি। এসব ধ্বংসাত্মক নিয়ামকের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ বাকরুদ্ধ। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা আজ বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছে জিম্মি। শিক্ষকরা দিনের পর দিন ক্লাস না নিলেও শিক্ষার্থীদের বলার কিছু নেই। কারণ স্বায়ত্তশাসিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির একজন পিয়ন পর্যন্ত নিজস্ব ক্ষমতা বহন করে। আর কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে বলা তো নিজ হাতে নিজের পায়ে কুড়াল মারা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর সার্টিফিকেট নিয়ে বের হওয়া যাবে না।

স্বায়ত্তশাসনের বর্তমান আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একমাত্র আচার্য তথা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছেই দায়বদ্ধ। এমনকি উপাচার্য, সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন বা বিভাগীয় সভাপতিরও কোনো কিছু বলার অধিকার নেই। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কোনো বোর্ডের অধীনে না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুষ্ঠিত হওয়ায় পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব থাকে কোর্স-সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ওপর। ফলে তিনি চাইলেই একজন শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে খেলতে পারেন। আর খেলছেনও বটে। নিয়মিত বিভাগে এসেও ক্লাস না নেওয়া যেন একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বরং ব্যক্তিগত ফেসবুক, আইডি, বিভিন্ন প্রজেক্ট, বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়, যখন শুনি, কোনো শিক্ষক ক্লাস নিতে এসে বলেন, 'এ বিষয়ে আমি আসলে ভালো করে পড়িনি, তোমরা একটু পড়ে নিও।'

এ ছাড়া পরীক্ষার খাতায় ইচ্ছামতো নম্বর দেওয়াটা তো বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পছন্দের কাউকে লিখলেও সেটার নম্বর দেওয়া হবে, না লিখলেও সেটার নম্বর দেওয়া হবে। আবার অপছন্দের কাউকে কোনোমতে পাস নম্বর দেওয়া হবে। তবে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের বলার কিছু থাকবে না। কারণ ওই শিক্ষকের হাতেই নির্ভর করছে তাঁর অনার্স ও মাস্টার্সের রেজাল্ট।

শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের প্রধান কারণ হলো, মেধার পরিবর্তে হাই লবিংয়ে নিয়োগ পাওয়া, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া, অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিওতে পার্ট টাইম কাজ করা, ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং ধ্বংসাত্মক শিক্ষকরাজনীতি। এ ক্ষেত্রে হাই লবিংয়ে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা তাঁদের ব্যর্থতা বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ঢাকতেই স্বেচ্ছাচারিতাকে বেছে নেন। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা যেন কোনো প্রশ্ন করার সুযোগই না পায়–শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে ভীতি তৈরি করাকেই তাঁরা বেশি প্রাধান্য দেন। আর রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় নিজ দলের বাইরের রাজনৈতিক সংগঠনের শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের বিমাতাসুলভ আচরণ তো আছেই।

আর এভাবেই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিম্মি হয়ে আছে বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছে। আমরা এই ধ্বংসাত্মক নীরবতা থেকে মুক্তি চাই। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করি। বিশেষ করে, আচার্য মহোদয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অনুরোধ করব, সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই সুনিপুণ কারিগর তৈরির জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করুন ও তাঁদের জন্য নীতিমালা তৈরি করুন।

লেখক : শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।